গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ১৯ সংখ্যা | ১৭ - ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

মোদি সরকার মুখোশ মাত্র
আসল শত্রু পুঁজিপতি শ্রেণি

কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়ের পর এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ ১০ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের ইতিহাসে কৃষক আন্দোলনের এই জয় নিঃসন্দেহে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সংগ্রামী কৃষক জনগণ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমস্ত দমন পীড়ন উপেক্ষা করে অসীম বীরত্বের সাথে এই লড়াই চালিয়ে গেছেন, সাত শতাধিক কৃষক আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি ও তাদের সেবাদাসদের মাথা নত করতে বাধ্য করেছেন। এক বছর ধরে চলা এই কৃষক আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কৃষকদের প্রায় সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই জয় জনগণের মধ্যে একটা আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছে। জনগণ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যদি সংঘবদ্ধ হওয়া যায়, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দীর্ঘস্থায়ী মরণপণ আন্দোলন গড়ে তোলা যায়, তা হলে একটা বর্বর ফ্যাসিস্ট সরকারকেও পরাস্ত করা যায়। দৃষ্টান্তসৃষ্টিকারী এই জয় নিঃসন্দেহে পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করবে। ইতিহাস সৃষ্টিকারী সংগ্রামী কৃষকদের আমরা লাল সেলাম জানাই।

কিন্তু সংকটগ্রস্ত পুঁজিপতি শ্রেণি জনগণের উপর একটার পর একটা আক্রমণ নামিয়ে আনবে এবং যত দিন পর্যন্ত আন্দোলনের আঘাতে পুঁজিপতি শ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উৎখাত করে সমস্ত ধরনের জুলুম ও শোষণমুক্ত একটা নতুন

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি
দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট

শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী শ্রমকোডের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ৭ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

১১ নভেম্বর দিল্লির জাতীয় কনভেনশনের যৌথ ঘোষণাপত্র অনুযায়ী আগামী ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চের এক অন্যতম অংশীদার হিসাবে এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় কমিটি দেশের সব স্তরের মেহনতি মানুষকে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক শ্রমিক-বিরোধী, জনবিরোধী এবং একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী দানবীয় নীতি ও আইন প্রণয়ন ও গায়ের জোরে সেগুলি কার্যকর করার মধ্য দিয়ে মেহনতি মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর সর্বাত্মক, আগ্রাসী আক্রমণ নামিয়ে এনেছে।

এই স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারের মাথা নোয়ানোর জন্য এবং মেহনতি মানুষের উপর তাদের নামিয়ে আনা ক্রমবর্ধমান ধ্বংসাত্মক আক্রমণ রুখে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের ধারাবাহিক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলনই একমাত্র পথ। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা ঐতিহাসিক এবং বীরত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন তিনটি কালা কৃষি আইন বাতিল করতে সরকারকে বাধ্য করে এটি খুবই পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে।

আফস্পা ঃ নিরাপত্তার নামে নির্বিচার হত্যার ছাড়পত্র

নিরপরাধ নাগরিকদের গুলি করে মেরে তাদের দেহ গোপনে নিয়ে পালাচ্ছে সেই দেশেরই সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা তাড়া করে সেই গাড়ি ধরলে দেখা গেল একটি গাড়ির মেঝেতে ত্রিপলের নিচে চাপা দেওয়া রয়েছে ৬টি নিথর দেহ। তার উপর বসে আছে সৈনিকরা। দেহগুলির বেশিরভাগ জামাকাপড় খুলে নেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীরা বুঝলেন পোষাক পাল্টে, হাতে অস্ত্র ধরিয়ে নিহতদের সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি হিসাবে সাজানোর চেষ্টা চলছে। প্রতিবাদ করতেই চলল অরও এক ঝাঁক গুলি। লুটিয়ে পড়লেন আরও ৭ জন গ্রামবাসী, আহত আরও বহু। দুই আহত গ্রামবাসীকে নিয়ে পালিয়ে গেল সেনার গাড়িগুলি (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১০ ডিসেম্বর ২০২১)।

শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ। ৯ ডিসেম্বর

এতদিনে জানা হয়ে গেছে, পৃথিবীর কোনও অন্ধকারময় প্রান্তের, কোনও স্বৈরাচারী বলে পরিচিত দেশে নয়, এমনটা ঘটেছে দুনিয়ার সর্ববৃহৎ 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্র বলে দাবি করা ভারতের মাটিতে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বলে দিলেন, গ্রামবাসীরা সেনার নির্দেশে গাড়ি থামায়নি বলেই তারা গুলি চালিয়ে ১৪ জনকে হত্যা করেছে। কোনও সভ্য দেশের সরকার তার নাগরিকদের হত্যাকাণ্ডের এমন নির্বিকার সাফাই দিতে পারে? পারলে সে দেশের সরকারকে গণতান্ত্রিক বলা যায়? গণতন্ত্রের প্রতি সামান্যতম সম্মান থাকলে কি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই হত্যাকাণ্ডের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতেন না? ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মী এবং অফিসারদের কঠিন শাস্তির প্রতিশ্রুতি সরকার দিত না? তৎক্ষণাৎ নির্বিচার হত্যার ছাড়পত্র আর্মড ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ারস অ্যাক্ট (আফস্পা) সর্বত্র বাতিল করার ঘোষণা করত না? তদন্তের জন্য দেরি না করে নিহত এবং আহতদের পরিবারের পাশে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও সাহায্য নিয়ে কি কেন্দ্র এবং রাজ্য দাঁড়াত না? আরও প্রশ্ন উঠছে, দেশের মানুষের পয়সায় পোষা নিরাপত্তা বাহিনী এ ভাবে নাগরিকদের নির্বিচার হত্যা করার পরেও কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নাগাল্যান্ডে তাঁর শরিক দলের মুখ্যমন্ত্রীর গদি ধরে রাখার কোনও নৈতিক অধিকার থাকে?

প্যারা কমান্ডোর বিশেষ সুরক্ষা বাহিনী আসাম থেকে ভুয়ো নম্বরপ্লেট লাগানো একাধিক গাড়িতে চড়ে ঢুকেছিল নাগাল্যান্ডে। সেখানে মন জেলার ওটিং গ্রামের কাছে তারা

দুয়ের পাতায় দেখুন

এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে
যুব আন্দোলন তীব্র করার শপথ

১১-১২ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন। সংবাদ পাঁচের পাতায়

আফস্পা ঃ নির্বিচার হত্যার ছাড়পত্র

একের পাতার পর

পাহাড় আর ঝোপের আড়ালে ওত পেতে ছিল। ঘরমুখী খনি শ্রমিকদের গাড়ি দেখেই কোনও হুঁশিয়ারি ছাড়াই তারা নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর গুলিবৃষ্টি শুরু করে। তাদের চেষ্টা ছিল নিহত শ্রমিকদের জঙ্গি সাজিয়ে ছবি তুলে কৃতিত্ব নেবে, পুরস্কার পাবে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারও 'শান্তি রক্ষার' বড়াই করে সরকারের সব ব্যর্থতাকে জনমানস থেকে আড়াল করতে পারবে। সরকার প্রচার করছে, বাহিনী নাকি অরুণাচল থেকে সন্ত্রাসবাদীদের আসার খবর পেয়েছিল! এখন তারা গোয়েন্দা ব্যর্থতার সাফাই গাইছে। পেগাসাসের মতো স্পাইওয়্যার কিনে সরকারের বিরোধী, সমালোচক কিংবা সাংবাদিকদের উপর গোয়েন্দাগিরির জন্য সরকারের দক্ষতা অসীম! অথচ জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় গড়ে ওঠা রাজকোষের শত শত কোটি টাকা দিয়ে পোষা গোয়েন্দা বাহিনী শুধু শাসকদলের হয়ে বিরোধীদের ভয় দেখানো, দল ভাঙানোর কাজ ছাড়া আর কোন কাজটা এ দেশে করছে? আরও প্রশ্ন, গোয়েন্দাদের ভুলের অজুহাতে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে সেনাবাহিনী নির্বিচার নরহত্যা করতে পারে?

আফস্পার বলে বলীয়ান সেনাকর্মীরা জানত, কোনও শাস্তি দূরে থাক, তাদের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। কারণ, কোনও এলাকায় আফস্পা জারি থাকলে নিরাপত্তাবাহিনী কেবলমাত্র সন্দেহের বশেই হত্যার জন্য গুলিও চালাতে পারে। শুধু সন্দেহের বশে যে কোনও বাড়িতে বিনা ওয়ারেন্টে সার্চ করা, কোনও বাড়ি-ঘর ভেঙে দেওয়া, যখন তখন যে কোনও ব্যক্তিকে কোনও অভিযোগ না জানিয়েই গ্রেপ্তার করতে পারে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে কোনও আদালতের সামনে হাজির করানোর দায়ও তাদের নেই। শত অন্যায় করলেও নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনও আদালতে অভিযোগ আনা যাবে না। যদিও আগে সাবধান করা এবং সন্দেহের যথেষ্ট কারণ থাকার শর্তটারও উল্লেখ আছে। কিন্তু তা মানতেই হবে, এমন কোনও কঠোর নির্দেশ নেই! ফলে হাতে যখন বন্দুক এবং অসীম ক্ষমতা, আর সামনে জনজাতিভুক্ত দরিদ্র মানুষ কিংবা দলিত অথবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষ থাকে, যাদের প্রতিরোধের শক্তি প্রায় নেই, তখন বীরত্ব ফলাতে দোষ কী! মনে রাখা দরকার কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার নাগাল্যান্ডে তাদের জোট সরকারের সাহায্যে অতি সম্প্রতি আফস্পার এক্তিয়ার নতুন করে এক বছরের জন্য বাড়িয়েছে। গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের আশঙ্কা, নাগাল্যান্ডের এই হত্যাকাণ্ড গোটা উত্তরপূর্ব ভারতেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শক্তি বাড়তে সাহায্য করবে। নাগাল্যান্ডের মানুষের জন্য শান্তি প্রক্রিয়া চরম ধাক্কা খাবে।

অফস্পার সাহায্যে ভুয়ো সংঘর্ষ এবং মিথ্যা অজুহাতে গ্রেপ্তারের ফলে কত মানুষের জীবন শেষ হয়ে গেছে তার সঠিক হিসাব সরকার কোনও দিন দেয়নি। তাতেও ১৯৭৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে শুধুমাত্র মণিপুরেই আফস্পার বলে ১ হাজার ৫২৮টি ভুয়ো সংঘর্ষের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল। আফস্পা আইনটি এসেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসকদের উত্তরাধিকার বেয়ে। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে ভাঙতে ব্রিটিশ সরকারের চারটি অর্ডিন্যান্সকে হুবহু নকল করে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস সরকার ১৯৫৮ সালে তৎকালীন আসামের অন্তর্গত নাগা পাহাড় ও অন্যান্য অংশে অশান্তির অজুহাতে আর্মড ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ারস (আসাম অ্যান্ড মণিপুর) অ্যাক্ট নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে আসাম অ্যান্ড মণিপুর কথাটা তুলে দেওয়া হয় এবং তা উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যেই প্রসারিত হয়। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৭ একই ধরনের আইন চালু ছিল পাঞ্জাবে। ১৯৯০ থেকে চলছে জম্মু-কাশ্মীরে।

কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত বিচারপতি জীবন রেড্ডির নেতৃত্বে গঠিত কমিশন ২০০৫ সালে আফস্পা সম্বন্ধে বলেছিল, 'এই আইন হল ঘৃণা, দমন-পীড়ন, স্বেচ্ছাচারের প্রতীক।' কমিশন আফস্পা বাতিলের সুপারিশ করে। কিন্তু ২০১৫ সালে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার এই সুপারিশ বাতিল করে দেয়। ২০০০ সালে মণিপুরের ইম্ফল উপত্যকার মালোম শহরে ১০ জন সাধারণ মানুষকে হত্যা করে আসাম রাইফেলস নামক আধা-সামরিক বাহিনী। আফস্পা প্রত্যাহারের দাবিতে অনশন শুরু করেন ইরম শর্মিলা চানু। যা ১৬ বছর একটানা চলেছে। ২০০৪ সালে প্রতিবাদী মহিলা থাংজাম মনোরমাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে এই একই বাহিনী। মণিপুরের ৩০ জন মহিলা নগ্ন হয়ে আসাম রাইফেলসের সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে বলেন, আমরা মনোরমার মা, এস ভারতীয় সেনা, আমাদেরও ধর্ষণ করার সাহস দেখাও। এই হত্যাকাণ্ডের ১০ বছর পর সুপ্রিম কোর্ট মনোরমার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দিলেও কোনও দোষীকে শাস্তি দিতে পারেনি। বিচারপতি সন্তোষ হেগড়ের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের কমিশনও বলে— আফস্পা বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ রুখতে ব্যর্থ। কমিশনের নির্দেশ সত্ত্বেও ভুয়ো সংঘর্ষের মামলায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) ৯ বছর কালক্ষেপ করে ২০১৮ সালে ১২ বছরের কিশোর আজাদ খানের হত্যার জন্য মেজর বিজয় সিং বালহারাকে দোষী সাব্যস্ত করে। কিন্তু দোষী মেজরের কোনও শাস্তি দূরে থাক বিচার শুরুই করা হয়নি। এই কমিশনের নির্দেশে সিট ৮৫ জন নাগরিকের মৃত্যুর বিষয়ে ৩৯টি মামলায় আসাম রাইফেলস সহ কম্যান্ডো বাহিনীর ১০০ জন কর্মী-অফিসারকে দায়ী করে। কিন্তু এদের শাস্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আফস্পা। যদিও ২০১৬ সালেই সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলেছে নিরাপত্তা বাহিনীর আফস্পা প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হতে পারে না। নাগরিকের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতার সংবিধান প্রদত্ত অধিকারকে তা লঙ্ঘন করতে পারে না। আফস্পার বলে হত্যা, ধর্ষণের মতো অপরাধেও কোনও শাস্তি হবে না, এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু মানবে কে? আদালত পুঁজিপতি শ্রেণির অধিকার রক্ষার রায় দিলে সরকার ব্যগ্র হয়ে ওঠে তা কাজে লাগাতে। আর সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার কথা কখনও যদি আদালত বলে, সে ক্ষেত্রে সরকার তা বাস্তবায়নের কোনও দায় অনুভব করে না, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে এটাই আজ স্বাভাবিক!

কংগ্রেস সরকার স্বাধীনতার পর থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদ রোখার নামে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং কাশ্মীর জুড়ে যে কোনও প্রতিবাদ ও বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখতে আফস্পাকে কাজে লাগিয়েছে। একই সাথে সারা দেশেই তারা নানা দমনমূলক আইন এনে গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিসরকে ক্রমাগত সংকুচিত করে গেছে। বিজেপি কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় বসার পর এই দমন পীড়নকেই 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রের প্রতীকে পরিণত করেছে। তাই কাশ্মীরে সেনার জিপের বনেটে এক সাধারণ নাগরিককে বেঁধে ঘোরানোর মতো জঘন্য কাজ করেও পুরস্কার পেয়েছেন সামরিক অফিসার। সদ্য প্রয়াত ভারতীয় সেনাপ্রধান কাশ্মীরে জঙ্গি সন্দেহ হলেই গণপিটুনিতে হত্যার দাওয়াই বাতলেছিলেন। সরকার এর কোনও প্রতিবাদ করেনি। সম্প্রতি কাশ্মীরে মানবঢাল হিসাবে দুই নিরপরাধ নাগরিককে ব্যবহার করে সেনাবাহিনী তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। মানুষের তীব্র প্রতিবাদের সামনে দায়সারা ভুল স্বীকার ছাড়া সরকার এবং সেনা কিছুই করেনি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা পুলিশ অ্যাকাডেমির অনুষ্ঠানে গিয়ে বলেছেন, নাগরিক সমাজকে শত্রু হিসাবে গণ্য করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১২ অক্টোবর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অনুষ্ঠানে বলেছেন, মানবাধিকার নিয়ে যারা সরকারের সমালোচনা করে তারা দেশের ক্ষতি করছে। তিনি মানবাধিকার বিষয়টিকেই 'সরকার বিরোধী রাজনীতির লেন্স দিয়ে দেখা' ব্যাপার বলেছেন। এই মুহূর্তে সারা ভারতে যে পরিমাণ মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, প্রতিবাদী সাধারণ মানুষ, ছাত্র, পরিবেশ কর্মী সহ নানা স্তরের প্রতিবাদীদের উপর দেশদ্রোহের অভিযোগ নির্বিচারে লাগিয়ে অসংখ্য মামলা করেছে সরকার, বহুজনকে মিথ্যা অভিযোগে জেলে ভরে রেখেছে, এতেই স্পষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার গণতান্ত্রিক অধিকার, বিচার পাওয়ার অধিকার, মানবাধিকারকে কী চোখে দেখে! বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ, আসামে বিচারের দায় প্রায় পুরোপুরি বর্তেছে পুলিশের উপরেই। বিচার দূরে থাক, কারও গায়ে একটা অপরাধী তকমা লাগিয়ে দেওয়া হলেই ওই সব রাজ্যে পুলিশ যে কোনও মানুষকে গুলি করে মারার অধিকার পেয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে গণতন্ত্রের ঠাটবাট হিসাবে সংসদীয় ব্যবস্থা যতটুকু টিকে আছে সেই সংসদেও কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার তোয়াক্কাই করছে না বিজেপি সরকার। সংসদীয় গণতন্ত্রের টিকে থাকা সামান্য খোলসটাও আজ স্বৈরাচারের দাপটে জীর্ণ।

দেশভক্তির নামে আজ সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীকেই দেশের ত্রাতা হিসাবে তুলে ধরছে সরকার। যুক্তি দিচ্ছে নির্বিচার দমনে এতটুকু ছাড় দিলেই নাকি বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা তুলবে। অথচ ১৯৫৮ থেকে শুরু করে ৬৩ বছর ধরে যথেচ্ছ হত্যার আইন চালু থেকেও উত্তর-পূর্বে বিচ্ছিন্নতাবাদকে নির্মূল করা যায়নি। কাশ্মীরে অবর্ণনীয় দমন পীড়ন চালিয়ে, বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিয়েও তা হয়নি। কারণ অস্ত্রের জোরে, সামরিক তাকতে এ কাজ কোনও দিনই হওয়ার নয়। নানা উপজাতি, নানা ভাষাভাষী অধ্যুষিত প্রান্তিক এলাকায় বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের জীবন-যন্ত্রণা লাঘব করতে স্বাধীনতার ৭৫ বছরেও শাসকরা নজর দেয়নি। ফলে বহু সঙ্গত কারণেই এই সমস্ত এলাকায় মানুষের ক্ষোভ জন্মায়। শাসকদের আচরণই তাদের বিচ্ছিন্নতার বোধ বাড়ায়। তার সুযোগ নেয় কিছু ধুরন্ধর শক্তি। এই সমস্যা নিরসনে প্রয়োজন দেশের সরকার এবং প্রশাসকদের জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। মালিক শ্রেণির সেবাদাস শাসকদের কাছে তা অসম্ভব। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সমস্যা সমাধানে অপারগ বুর্জোয়া ব্যবস্থার রক্ষকরা একাজ করতে পারে না। এছাড়াও তারা সব সময়েই চায় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দমনপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে নিরপত্তাবাহিনীগুলির নখ-দাঁতে বেশি বেশি করে শান দিয়ে তাদের সাহায্যে জনগণকে অবদমিত করে রাখতে। বহু ক্ষেত্রে বরং বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদকে সরকার বাড়তেই দেয়, যাতে পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভকে বিপথগামী করা যায়। একই সাথে তা দেখিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি বাড়ানো যায় এবং পুঁজিপতিদের অস্ত্র ব্যবসার রমরমা আরও বাড়তে পারে।

নাগাল্যান্ডের হত্যাকাণ্ড আজ সারা দেশের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এই বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের জীবনের দাম শাসকের কাছে কতটুকু? গণতন্ত্রের ন্যূনতম শর্ত হিসাবেই তাই আজ আফস্পা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি তোলা যে কোনও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কর্তব্য।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা লোকাল কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড মঞ্জুর আলম ২২ নভেম্বর বার্ধক্যজনিত রোগে বহরমপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

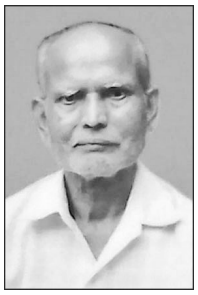

মরদেহ বাড়িতে নিয়ে এলে এলাকার সহমর্মী মানুষ ও দলের নেতা-কর্মীরা শ্রদ্ধা জানান। তিনি চরলবণগোলা হাই মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। আজীবন তাঁর প্রিয় নওজওয়ান ক্লাব লাইব্রেরির কর্মকর্তাদের তিনি একজন ছিলেন। শিক্ষাদরদি মানুষ হিসাবে তিনি দলের ভাষা শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। এলাকায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় ছিলেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে মিশতে পারতেন অবলীলায়। বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন প্রথম থেকে। শ্রীপত সিং কলেজে পড়ার সময় তিনি এআইডিএসও-র সংস্পর্শে আসেন এবং পরবর্তীকালে দলের কাজ শুরু করেন। ভগবানগোলায় দলের প্রথম থানা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। অসুস্থ অবস্থাতেও প্রতিনিয়ত দলের খোঁজখবর রাখতেন। নিয়মিত দলের বই-পত্র ও গণদাবী পড়তেন। মৃদুভাষী কোমল হৃদয়ের কমরেড মঞ্জুর আলমের মৃত্যুতে দল ও এলাকার মানুষ একজন সত্যিকারের অভিভাবককে হারাল।

কমরেড মঞ্জুর আলম লাল সেলাম

একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই এমএসপিতে আপত্তি সরকারের

নজিরবিহীন কৃষক আন্দোলনের চাপে মাথা নত করতে বাধ্য হল বিজেপি সরকার। তিনটি কৃষি আইন যেমন মোদি সরকারকে প্রত্যাহার করে নিতে হল তেমনই কৃষকদের অন্য কিছু দাবিও মেনে নিতে হল। এই জয় ঐতিহাসিক। উল্লসিত সারা দেশের কৃষকরা। দেশের আপামর শোষিত মানুষ এই জয়ে উজ্জীবিত। জনজীবনের যেখানেই শাসক শ্রেণির শোষণ-অত্যাচারের স্টিমরোলার চলছে তেমন প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষিত মানুষ কৃষক আন্দোলনের সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে আন্দোলন জোরদার করার প্রস্তুতি গড়ে তুলছেন।

আন্দোলনকে দমন করার, ছত্রভঙ্গ করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি সরকার। বিজেপি নেতারা ঘোষণা করেছিলেন কৃষি আইন তাঁরা প্রত্যাহার করবেন না। কৃষকদের বিভ্রান্ত করতে প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছেন, এই আইন কৃষকদের, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছে। কিন্তু কোনও মিথ্যা যুক্তিই কৃষকদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি। সব রকম প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে কৃষকরা তাঁদের আন্দোলনে অনড় ছিলেন। যত দিন গেছে আন্দোলন আরও বিস্তৃত আরও শক্তিশালী হয়েছে। কৃষকদের মনোবল আন্দোলনের আগুনে পোড় খেয়ে আরও মজবুত হয়েছে। আন্দোলনের নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের কৃষকরা, বিশেষত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি দিল্লির আশেপাশের রাজ্যগুলি থেকে আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যায় যোগ দিয়েছে। সর্বত্র কৃষক মহাপঞ্চায়েতে লাখো মানুষের সমাবেশ হয়েছে। অন্য রাজ্যগুলিতে কৃষকরা আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে লাগাতার কর্মসূচি নিয়েছে। বিজেপির সংগঠিত এলাকাগুলিতেও কৃষকরা সরকারের কৃষকস্বার্থ বিরোধী ভূমিকায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এই সব এলাকার কৃষকরা বহু জায়গায় ব্যানার টাঙিয়ে দিয়েছে, 'এখানে বিজেপি নেতাদের প্রবেশ নিষেধ'। উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য, যাকে বিজেপি নেতারা তাঁদের খাসতালুক বলে মনে করেন, সেখানে গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে।

এই আন্দোলনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যথার্থ শত্রুকে চিনতে পারা। তাই আন্দোলনের অভিমুখ শুধু বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ছিল না। বিজেপিকে সামনে রেখে যে একচেটিয়া পুঁজি এই আইন সরকারকে দিয়ে নিয়ে এসেছিল আইনে তার স্বার্থটি, তার আগ্রাসী, জনস্বার্থ বিরোধী চরিত্রটি কৃষকদের কাছে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই স্লোগান উঠেছিল কর্পোরেট পুঁজির বিরুদ্ধে। জনগণের সমস্ত দুর্দশার মূলে যে এই পুঁজিপতি শ্রেণি তা-ও আন্দোলনের ময়দানে কৃষকদের কাছে ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাস্তবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সরকার পরিবর্তনের দ্বারা পুঁজির স্বার্থে নেওয়া নীতির পরিবর্তন হয় না। পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী একটি দলের সরকারের বদলে তাদেরই আর একটি দলের সরকার আসে মাত্র।

এই আন্দোলন নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা প্রদেশের মানুষের ঐক্যের যে নজির রেখে গেল তা যেমন অভূতপূর্ব, তেমনই শিক্ষণীয়। নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহরা সাম্প্রদায়িকতা আর জাতপাতের সংঘর্ষ-বিভেদকে যেভাবে প্রকট করে তুলেছে তা যে ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, আন্দোলনে নানা ধর্ম, বর্ণ, প্রদেশের মানুষ যেভাবে এক সঙ্গে থেকেছেন, খেয়েছেন, লড়েছেন, সম্প্রদায়, জাতপাতের ঊর্ধ্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, তা-ই যে আসলে ভারতীয় সংস্কৃতি, এই আন্দোলন গোটা বিশ্বের মানুষের সামনে তা তুলে ধরেছে।

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

বিজেপি সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দেখে বুঝে যান যে, যত সময় যাবে ততই তাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের রোষ আরও শক্তি নিয়ে ফেটে পড়বে। এই অবস্থাতেই তাঁরা পিছু হঠার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। তাঁরা প্রথমে শুধু কৃষি আইন তিনটি তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। মনে করেন এতেই বোধহয় কৃষকরা তাঁদের আন্দোলন গুটিয়ে নেবেন। কিন্তু কৃষকরা তাঁদের বাকি দাবিগুলিতে অনড় থাকেন এবং সেগুলি না মানা হলে আন্দোলন আরও জোরদার করার কথা ঘোষণা করেন। উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনের সামনে 'যতটা বাঁচানো যায়'— এই মনোভাব থেকে বাকি দাবিগুলির আরও কয়েকটি তাঁরা শেষ পর্যন্ত মেনে নেন এবং কয়েকটি নিয়ে কৃষক মোর্চার সদস্যদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এর মধ্যে কৃষকরা যে দাবিগুলিতে সব চেয়ে জোর দিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস বা এমএসপি) আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি। এই দাবিটি নিয়ে সরকার ক্রমাগত টালবাহনা করে চলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এতে বাজেটের অর্ধেক টাকা কৃষকদের ফসল কিনতে খরচ হয়ে যাবে। সরকারপন্থী কৃষি বিশেষজ্ঞরাও সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, এর ফলে নাকি সরকারের ১৭ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়ে যাবে।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে আইনি স্বীকৃতি দিলে সরকারের খরচ কত হবে, সেই খরচ সরকারের পক্ষে করা সম্ভব কি না, অর্থনীতির উপর তার কী প্রভাব পড়বে প্রভৃতি প্রশ্ন আলোচনার আগে দেখা যাক, ফসলের সহায়ক মূল্য কৃষকের জন্য কতখানি প্রয়োজন এবং তা আইনসম্মত করা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কি না।

কৃষকদের দুর্দশা

সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট বলছে, ভারতে প্রতি ১২ মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করে। ২০১৯ সালেই শুধু আত্মহত্যা করেছে ৪২ হাজারের বেশি কৃষক। গত ১৫ বছরে এই সংখ্যাটা চার লক্ষের উপর। যে কৃষক গোটা দেশের মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্ব পালন করে তাদের এমন হাজারে হাজারে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে কেন? আত্মহত্যার একমাত্র কারণ ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া। প্রতি বছর চাষের খরচ লাফিয়ে বাড়ছে। সার বীজ কীটনাশক সেচ প্রভৃতি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি উপকরণ এখন দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির দখলে। উদারনীতির নামে সরকার এগুলি সবই মুনাফার জন্য তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। ফলে ১০ বছর আগে সার বীজ কীটনাশকের যা দাম ছিল এখন তারা সরকারি মদতেই তার তিন-চার গুণ বাড়িয়েছে। ফলে চাষের জন্য খরচের পরিমাণ অবিশ্বাস্য রকমে বেড়েছে। ভারতের প্রায় ৮০ শতাংশ কৃষক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক। চাষের এই বিপুল ব্যয় তাদের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। স্বাভাবিক ভাবেই চাষের জন্য তাদের ঋণ করতে হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি ছোট চাষিদের ঋণ দেয় না। তাদের গিয়ে হাত পাততে হয় সুদখোর গ্রামীণ মহাজনদের কাছে। সেখানে সুদের পরিমাণ ১০০ থেকে ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত। এতেও ততটা অসুবিধা হত না যদি চাষিরা ফসলের ন্যায্য তথা লাভজনক দাম পেত। বাস্তবে কী হয়?

কৃষির বাজারটি মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের দখলে

কৃষি-ফসলের বাজারে ফড়ে, মহাজন, মাঝারি, বড় ও একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের চক্র ফসল ওঠার সময়ে দামকে একেবারে তলানিতে নিয়ে যায়। ঋণগ্রস্ত চাষি সুদ সহ ঋণ শোধ করতে, পরের ফসলের খরচ জোগাড় করতে, সংসার প্রতিপালন করতে ফসলের অভাবি বিক্রিতে বাধ্য হয়। ব্যবসায়ীরা চাষির থেকে জলের দামে ফসল কিনে নেয়। তারপর তা মজুত করে রেখে বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে। ফসলের দাম লাফিয়ে বাড়তে থাকে। সেই কম দামে কেনা খাদ্যপণ্যই দেশের মানুষকে আগুন দামে কিনতে বাধ্য করে। অন্য দিকে চাষির ঋণ আর শোধ হয় না। আগের ঋণের সাথে নতুন ঋণ যোগ হয়ে তার পরিমাণটাকেই বাড়িয়ে তোলে। এর সাথে আছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রোগপোকার আক্রমণ প্রভৃতি। ঋণ শোধের কোনও উপায় দেখতে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত চাষির কাছে একটি রাস্তাই খোলা থাকে। আত্মহত্যা।

যে পেঁয়াজ এখন আমরা ৪০-৫০ টাকা কেজি দামে বাজার থেকে কিনছি, সেই পেঁয়াজ মহারাষ্ট্রের নাসিকের চাষিরা ১-২ টাকা দামে বিক্রি করেছে। উত্তরপ্রদেশের আখ চাষি কিংবা মহারাষ্ট্রের তুলো চাষিরাও একই রকম ভাবে জলের দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এ রাজ্যে সরকার এ বছর ধানের সহায়ক দাম কুইন্টাল প্রতি ১৯৪০ টাকা ঘোষণা করেছে। কিন্তু ঘোষণাই সার। কৃষকরা বাজারে বিক্রি করছে ১১০০ টাকা, যা উৎপাদন খরচের অনেক নীচে। সরকার যে পরিমাণ ধান কেনার কথা ঘোষণা করেছে তা ধানের মোট পরিমাণের এক নগণ্য অংশ মাত্র। সে-টুকু কেনা নিয়েও চলছে ব্যাপক দুর্নীতি। চাষিকে এখন শুধু স্লিপ ধরানো হচ্ছে, যা নিয়ে তারা সামান্য পরিমাণ ধানও তিন মাস পরে বিক্রি করতে পারবে। আলুর ক্ষেত্রে তো কোনও সহায়ক মূল্যই নেই। ফলে যে আলু ওঠার সময়ে চাষিরা প্রতি কেজি ৩-৪ টাকায় বিক্রি করে তা-ই এখন সাধারণ মানুষ বাজার থেকে ২০-২২ টাকা দামে কিনছে। গত বছর এই দাম ৫০ টাকায় উঠেছিল।

কৃষকরা কী চায়

চাষিকে ঋণে ডুবে যাওয়া থেকে, আত্মহত্যা থেকে বাঁচাতে হলে ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত করা দরকার। কিন্তু তা তো চাষির ইচ্ছেয় হবে না। তা হতে পারে একমাত্র সরকার ন্যূনতম সহায়ক দাম বেঁধে দিলে। আবার শুধু বাঁধলেই হবে না, তা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং তার জন্য তাকে আইন আনতে হবে। আইনকে কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তা ছাড়া চাষিকে যাতে ঋণ করতে না হয় সে-জন্য সবার আগে চাষের খরচ কমাতে হবে। তা হতে পারে একমাত্র সার বীজ কীটনাশক সহ সব ধরনের কৃষিউপকরণের উপর একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের অবসান ঘটানোর দ্বারাই। সরকারকেই এই সব উপকরণ সস্তা দরে চাষিদের সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকার এখন মোট ২৩টি ফসলের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে। কিন্তু তা ওই ঘোষণামাত্রই। ভুট্টার ঘোষিত সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ১৮৫০ টাকা হলেও চাষিরা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে ১১০০ থেকে ১৩৫০ টাকার মধ্যে। এমএসপি বাধ্যতামূলক না হওয়ায়, এখনও পর্যন্ত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেওয়া না দেওয়া সরকারের মর্জি। ইচ্ছা করলে সরকার এমএসপি ঘোষণা করতে পারে, নাও পারে। তাই কৃষক আন্দোলন থেকে যথার্থই দাবি উঠেছে এমএসপি আইনসঙ্গত এবং বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই দাবিও উঠেছে,

সাতের পাতায় দেখুন

পূর্ব মেদিনীপুরে মহিলা বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত নীলক্যা অঞ্চলে গত নভেম্বর মাসে এক সপ্তাহের ব্যবধানে দু'জন গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, দুটি পরিবারেই স্বামী ও শাশুড়ি দীর্ঘদিন ধরেই গৃহবধূ দুজনের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত। দুটি মৃত্যুর ঘটনাতেই দোষীদের শাস্তির দাবিতে ১ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রামতারকহাট আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এর আগে বিষয়টি তমলুক থানাকে জানানো হয়। স্থানীয় হরশংকর বাজার থেকে মিছিল করে মহিলারা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যায়। নেতৃত্ব দেন সবিতা সামন্ত, পুতুল দোলই, সুনন্দা আদক প্রমুখ।

রেলের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে
নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আন্দোলন

রেলের সার্বিক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে, ১৫০টি ট্রেন বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে, প্যাসেঞ্জার

ট্রেনগুলিকে এক্সপ্রেস ট্রেনে রূপান্তরিত করে রেলভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে, আদ্রা শিরোমণি প্যাসেঞ্জার, হাওড়া-ঘাটশিলা প্যাসেঞ্জার, সাঁতরাগাছি-ঝাড়গ্রাম প্যাসেঞ্জার, হাওড়া-টাটা প্যাসেঞ্জার, দীঘা-হাওড়া কান্ডারি এক্সপ্রেস চালু এবং সমস্ত স্টেশনের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো সহ ২৯ দফা দাবিতে খড়গপুর ডি আর এম-এর কাছে স্মারকলিপি দেয় নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে (খড়গপুর ডিভিশন) কমিটি। উল্লেখ্য, ১৪ নভেম্বর প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডলের সভাপতিত্বে মেচেদার বিদ্যাসাগর হলে এক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে (খড়গপুর ডিভিশন)-এর শাখা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির পক্ষ থেকে ১০ ডিসেম্বর ডিআরএম দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের আগে খড়গপুর সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড এবং ডি আর এম অফিসের সামনে সভার আয়োজন করা হয়।

বক্তব্য রাখেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুরঞ্জন মহাপাত্র এবং সরোজ মাইতি। সুরঞ্জন মহাপাত্রের নেতৃত্বে তিনজনের প্রতিনিধি দল ডিআরএম-কে স্মারকলিপি দেন।

বাসে ছাত্র কনসেশনের দাবি, রাঙাপানিতে অবরোধ

এআইডিএসও-র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এক তৃতীয়াংশ ছাত্র-কনসেশনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তকে মান্যতা না দিয়ে বাস মালিকরা পুরো ভাড়ার জন্য জুলুম চালাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের উপর। তারা সরকারি নির্দেশিকা অগ্রাহ্য করে সিন্ডিকেটের সাথে হাত মিলিয়ে ইচ্ছা মতো ভাড়া বাড়িয়েছে, ফলে বিপদগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। অথচ রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নীরব। বলা চলে, সরকারের অলিখিত মদতেই এসব চলতে পারছে।

৮ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি থেকে ফাঁসিদেওয়া যাওয়ার পথে এক ছাত্রী বাসে ভাড়া দিতে গেলে তাকে হেনস্থা করা হয় এবং জোর করে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার প্রতিবাদে পরদিনই এআইডিএসও দার্জিলিং জেলা কমিটি রাঙাপানিতে পথ অবরোধ করে এবং কনশেসন চালুর দাবি করে।

অবরোধে নেতৃত্ব দেন কমরেডস সৌরভ মহন্ত, রাজু রায় ও জাগির হোসেন, নবনীতা হংস। পরিবহণে এক তৃতীয়াংশ ছাত্র কনসেশনের দাবিতে আন্দোলনে জেলার সকল স্তরের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এআইডিএসও নেতৃত্ব।

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু
তদন্ত দাবি সিপিডিআরএস-র

নদিয়া জেলার কালীগঞ্জের বাসিন্দা আব্দুল গনি শেখকে জাল নোটের কারবারি সন্দেহে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ গ্রেপ্তার করে ৪ ডিসেম্বর ভীমপুর থানায় নিয়ে যায়। ওই দিন রাতে তাকে মৃত অবস্থায় শক্তিনগর হাসপাতালে নিয়ে আসে। পুলিশ দাবি করে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রকৃত সত্য উদঘাটনের দাবি করে সি পি ডি আর এস জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ৬ ডিসেম্বর ডেপুটেশন দেওয়া হয়। লকআপে বন্দি মৃত্যুর জন্য দায়ী পুলিশ কর্মীদের শাস্তির দাবি করা হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক জয়দীপ চৌধুরী ও অন্যান্য নেতারা।

নাগাল্যান্ডে সেনাবাহিনীর গণহত্যা চালানোর প্রতিবাদে আফস্পা, ইউএপিএ প্রভৃতি দমনমূলক আইন প্রত্যাহারের দাবিতে নাগরিক অধিকার রক্ষা সংগঠন সিপিডিআরএস-এর ডাকে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার রক্ষা দিবসে জেলায় জেলায় নানা কর্মসূচি পালিত হয়। (ছবি) পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে সভা।

অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলি খোলার দাবি

সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি চালু করে রান্না করা খাবার পরিবেশনের দাবিতে সোচ্চার হল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স ও হেল্পার্স ইউনিয়ন।

১২ ডিসেম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কল্যাণী ব্লক সম্মেলন। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক মাধবী পণ্ডিত এবং এআইইউটিইউসির প্রবীর দে

৯ ডিসেম্বর হাওড়ার কাশমলি ও ঘোড়াবেড়িয়া-চিৎনান অঞ্চলের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়ে পারবাক্সিতে একটি সভা হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের সংগঠক সরস্বতী ভৌমিক ও চন্দনা সামন্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি হাওড়া জেলা সংগঠক নিখিল বেরা। বক্তারা বলেন, গত দু'বছর ধরে সারা দেশের মতোই এ রাজ্যে ৬০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের প্রায় ৪০ লক্ষ উপভোক্তার পরিপূরক পুষ্টির জন্য রান্না করা গরম খাবার পরিবেশন বন্ধ হয়ে আছে। এর ফলে মা ও শিশুদের অপুষ্টি বাড়ছে। তাই দ্রুত স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খোলা জরুরি। সভা থেকে শ্যামলী ঘোড়াকে সভানেত্রী, অর্চনা বাগকে সম্পাদিকা ও সুতপা মণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ করে আমতা ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

ব্যাঙ্ক কর্মীদের সভা

২৩ নভেম্বর হুগলির তারকেশ্বরে টাউন ক্লাব হলে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের ডাকে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক, এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নারায়ণ পোদ্দার। উপস্থিত ছিলেন সহ সম্পাদক কমরেডস তপন মীর, সৌম্যজ্যোতি অধিকারী, শুভ্রজিৎ বাগ প্রমুখ। সভায় হুগলি জেলার সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

কলকাতা কর্পোরেশনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে এসইউসিআই(সি) প্রার্থীদের প্রচার

ওয়ার্ড নং ১৯

ওয়ার্ড নং ৩৮

ওয়ার্ড নং ১২৬

ওয়ার্ড নং ৫৬

ওয়ার্ড নং ১০০

ওয়ার্ড নং ৭৯

ওয়ার্ড নং ১২৩

শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে অনুষ্ঠিত হল সর্বভারতীয় যুব সম্মেলন

প্রবল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন ১১-১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায়। সব বেকারের কাজ, চুক্তিভিত্তিক নয় স্থায়ী নিয়োগ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ ও ছাঁটাই বন্ধ, চাকরির পরীক্ষা ও নিয়োগকে দুর্নীতিমুক্ত করা এবং উত্তীর্ণদের নিয়োগকে সুনিশ্চিত করা, মূল্যবৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িকতা রোধ সহ অন্যান্য নানা দাবিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ২৪টি রাজ্যের ছ'শোর বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড রামনজানাপ্পা আলদালি, যুবজীবনের সমস্যা ও আন্দোলনের নানা দিক নিয়ে তৈরি উদ্ধৃতি ও ছবির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এসইউসিআই(সি)র পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়ক। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি)র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং।

কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে এক বিশাল মিছিল অনুশীলন কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে ঘাটশিলা শহর পরিক্রমা করে (ছবি)। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমরেডস প্রতিভা নায়ক ও রামনজানাপ্পা আলদালি। সম্মেলনে নানা প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন ১৩৫ জন প্রতিনিধি। সম্মেলন থেকে কমরেড অমরজিৎ কুমারকে সম্পাদক ও কমরেড নিরঞ্জন নস্করকে সভাপতি করে ৮১ জনের কমিটি গঠিত হয়। সমাপ্তি ভাষণ দেন এসইউসিআই(সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। সম্মেলনের দাবিগুলি নিয়ে দেশজুড়ে শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে প্রতিনিধিরা নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যান।

এআইডিওয়াইও-র উত্তরপ্রদেশ সম্মেলন

বেকার সমস্যা সহ যুব ও জনজীবনের নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১৪ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে এআইডিওয়াইও-র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড জুবের রব্বানি এবং এস ইউ সি আই (সি)-র প্রয়াগরাজ জেলা সম্পাদক কমরেড রাজবেন্দ্র সিং। রাম কুমারকে সম্পাদক ও মকরধ্বজকে সভাপতি করে নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান
সেচমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

অবিলম্বে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্গত শিলাবতী নদী এলাকার নিম্নাংশ খনন করে নদীর শক্তপোক্তকরণ, রূপনারায়ণ-কেলেঘাই-চণ্ডীয়া নদী সংস্কার, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বন্যা দুর্গত ও জলবন্দি এলাকার নিকাশি খালগুলি আগামী বর্ষার পূর্বেই পূর্ণসংস্কার, শিলাবতী নদীর সাহেবঘাটে কংক্রিট ব্রিজ নির্মাণ সহ পাঁচ দফা দাবিতে ৮ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি ও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের সেচ দপ্তরের মন্ত্রীকে জলসম্পদ ভবনে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

ডেপুটেশনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, অশোকতরু প্রধান, দেবাশীষ মাইতি, কানাইলাল পাখিরা, অর্ধেন্দু মাজী প্রমুখ। মন্ত্রী দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

পাঠকের মতামত

ডিগ্রি হবে, শিক্ষা নয়

৭৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যার গণদাবীতে 'অনলাইন শিক্ষা ঃ শিক্ষা গৌণ, মুখ্য মুনাফাই' শীর্ষক রচনাটিতে অনলাইন শিক্ষার মূল দিকটি তুলে ধরা হলেও, মুনাফা শিকারিদের উগ্র লালসা মেটাতে সরকারের অতি ব্যগ্র প্রয়াসে শিক্ষার প্রাণসত্তা নাশের ভয়াবহতার আরেকটি দিক অনালোচিত থেকে গেছে মনে করি।

জাতীয় শিক্ষানীতির এক একটি ক্ষতিকর বিষয় দ্রুত রূপায়ণের জন্য ইউজিসি ক্রমাগত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ পাঠিয়ে চলেছে। 'ব্লেন্ডেড মোড' তেমনই একটি নির্দেশ। এই মোডে ৪০ শতাংশ অনলাইন এবং ৬০ শতাংশ অফলাইন শিক্ষার সাধারণ নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু ব্লেন্ডেড মোড সম্পর্কিত ইউজিসি-র ৪৮ পাতার ডকুমেন্টটি ভালভাবে পড়লেই বোঝা যায় আক্রমণটা আরও মারাত্মক। সেখানে বলা হয়েছে, অনলাইন টিচিং ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, যতটা অনলাইন টিচিং বাড়বে, ঠিক ততটাই অফলাইন টিচিং কমবে। ফলে, পুরো প্রথাগত শিক্ষাকেই অনলাইন নির্ভর করে তোলা হচ্ছে। তাতে বর্তমান কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হয়ে উঠবে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত অনলাইন শিক্ষার সেন্টার। করোনা পরিস্থিতিতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গুগুল মিটে বা জুম অ্যাপে যে অনলাইন ক্লাস চলেছে, সেখানে পড়ানোর সময় ছাত্ররা সরাসরি যুক্ত থেকেছে— যাকে বলা হয় সিনক্রোনাস পদ্ধতি। কিন্তু ব্লেন্ডেড মোডে তার থেকেও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে অ্যাসিনক্রোনাস পদ্ধতির উপর। এখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আপলোড করা ভিডিও ছাত্ররা নানা অ্যাপের মাধ্যমে দেখে শিখবে। শিক্ষককে সরাসরি পাবে না।

আবার ব্লেন্ডেড মোডে অফলাইন শিক্ষার কথা যেটা বলা হচ্ছে, তার মধ্যে থাকছে ফিল্ড ভিজিট, স্পোর্টস, ফিজিক্যাল ট্রেনিং, অ্যাপ্রেনটিসশিপ, ফিজিক্যাল ল্যাব, এমনকি লাইব্রেরি থেকে বই দেওয়া নেওয়া পর্যন্ত। শিক্ষকদের ভূমিকা শুধু ১০-১৫ মিনিটের প্রারম্ভিক বলা বা সারাংশ টানা। এভাবে শিক্ষার বহু দিনের পরীক্ষিত পদ্ধতিকে বাতিল করে শিক্ষাকে কর্পোরেটের নিয়ন্ত্রিত পণ্যে পরিণত করতে চলেছে।

অ্যাসিনক্রোনাস পদ্ধতিতে শিক্ষকেরও তেমন প্রয়োজন হবে না। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের মতো যারা বৃহৎ শিক্ষা ব্যবসায়ী, অর্থাৎ যে গ্রুপের পরিচালনায় বহু কলেজ রয়েছে, তারা একজন শিক্ষককে দিয়ে একবার একটি ক্লাস ভিডিও করে আপলোড করিয়ে নিলে, সেটা দিয়েই সবগুলি কলেজের ক্লাস করে নেবে। তার ফলে বেশি শিক্ষক নিয়োগ না করে, আপলোডেড ভিডিওগুলি অ্যাসিনক্রোনাস মোডে বছরের পর বছর চালিয়ে যেতে থাকবে।

বিশ্বব্যাপী মন্দা পরিস্থিতিতে কর্পোরেটের মুনাফা লোটার উর্বরক্ষেত্র হয়ে উঠবে শিক্ষা। শিক্ষকহীন ব্যবস্থায় ডিগ্রি হবে শিক্ষা নয়। শিক্ষকের কাছ থেকে মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রভৃতি মনুষ্য-গুণ অর্জনের কোনও সুযোগ তাদের থাকবে না।

তপন চক্রবর্তী
বেহালা, কলকাতা

বেসরকারি হলেই সামাধান!

বেসরকারিকরণ হলে নাকি পণ্যের এবং পরিষেবার মান উন্নত হয়, এরকম একটা ধারণায় অনেকের বিশ্বাস। নিজের মতো কিছু যুক্তি খাড়া করে তারা বলেন, অমুক প্রতিষ্ঠান যখন সরকারি ছিল তখন ঘন্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হত। কিন্তু এখন বেসরকারি পরিষেবা কত উন্নত। অমুক অফিসে উৎকোচ দিয়েও কাজ হয় না। পুরোটাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ আগে ঘন ঘন চলে যেত। এখন লোডশেডিং হয় না বললেই চলে।

এই ধরনের কথা প্রায়শই শোনা যায়। শুনে শুনে অনেকেই সরল মনে বিশ্বাস করেন, সত্যি বেসরকারিকরণ হলেই বোধহয় ভাল। এত ঝামেলা আর সহ্য হয় না। টাকা দেব, উৎকোচ দেব, সময় দেব, অথচ পরিষেবা পাব না, সেটা মানা যায় না।

প্রশ্ন হল, একজন ব্যক্তি মালিকের দ্বারা পরিচালিত কোনও প্রতিষ্ঠান যদি আপনার যুক্তিতে উন্নত পরিষেবা দেওয়ার সামর্থ্য রাখে, তবে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র কেন উন্নত পরিষেবা দিতে সমর্থ নয়? কীসের অভাবে রাষ্ট্র তা দিতে ব্যর্থ হয়? রাষ্ট্র কি পারে না ব্যক্তি মালিকের মতো কর্মসংস্কৃতি সৃষ্টি করতে? প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম ভঙ্গ করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কি খুব কঠিন? উৎকোচ, স্বজনপোষণ, অনিয়মের জন্য রাষ্ট্র নানান ব্যবস্থা অতি সহজেই গ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্রের নিজের পরিচালনায় প্রতিরক্ষা দপ্তর কেমন দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়। কীভাবে হয়? কারণ একটাই। রাষ্ট্র চায় তাই হয়। যার হাতে পুলিশ মিলিটারি সহ নানা শক্তিশালী হাতিয়ার আছে, তার পক্ষে একটা সাধারণ পরিষেবা প্রদানমূলক দপ্তর পরিচালনা করা সত্যিই কি খুব কঠিন?

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি মালিক যদি উন্নত পরিষেবা প্রদানে সমর্থও হয়, সেটা কি ন্যায়সঙ্গত? সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান কি তাহলে ব্যক্তি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া উচিত? যদি ধরে নিই একটা দেশের সকল পণ্য পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মালিক কয়েকজন ব্যক্তি, তাহলে সেই সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর যে বিপুল মুনাফা, স্বাভাবিকভাবেই তার মালিকানা থাকবে ওই কয়েকজন ব্যক্তির হাতে। সম্পদের চরম কেন্দ্রীকরণের ফলে চূড়ান্ত বৈষম্য কায়েম হবে। এ কখনও কাম্য হতে পারে?

রাষ্ট্র কেন তার সকল নাগরিক পরিষেবার দায়িত্ব ব্যক্তি মালিকের হাতে তুলে দিতে চাইছে? আপনারা কেন উন্নত পরিষেবা পাওয়ার জন্য বেসরকারি পরিষেবা কিনবেন? নাগরিক হিসাবে আপনি কেন রাষ্ট্রের উন্নত পরিষেবা দাবি করবেন না? কেন রাষ্ট্র আপনার ন্যায্য নাগরিক পরিষেবার দায়িত্ব ব্যক্তি মালিকের হাতে সমর্পণ করতে চায়? আপনার আমার সবার বিপুল ট্যাক্স রাষ্ট্র গ্রহণ করে আমাদেরই পরিষেবা প্রদানের জন্য। সেই দায়িত্ব একটা জনকল্যাণকামী বলে দাবিদার রাষ্ট্র কি এড়িয়ে যেতে পারে?

এ ভাবে চললে, আপনি দেখবেন ভবিষ্যতে কোনও সরকারি স্কুল, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক কিছুই থাকবে না। সবকিছুই আপনাকে বাজার মূল্যে কিনতে হবে। একবার ভেবে দেখুন তো কত জন মানুষের এই ক্রয়ক্ষমতা আছে? একদিকে আপনার ক্রয়ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান অবনতি, আর একদিকে সমস্ত পণ্যের অগ্নিমূল্য। ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্কের এই সামাজিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতায় সামাজিক অবক্ষয় অনিবার্য। একদিকে সীমাহীন সম্পদের প্রাচুর্য, আর একদিকে সীমাহীন দারিদ্র। এই চরম সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্য পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু রূপ। তাই এই ব্যবস্থার অবসান চাই। কারণ সকল সমস্যার মূলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

সূর্যকান্ত চক্রবর্তী
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

পুলিশই নারী নিগ্রহকারী
বিধাননগরে থানায় বিক্ষোভ

সল্টলেকে দুই পুলিশ কর্মীর দ্বারা নারী নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদে ১৩ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও এবং অল ইন্ডিয়া এম এস এস বিধাননগর অঞ্চলে মিছিল করে বিধাননগর উত্তর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। দাবি জানানো হয়— দোষী পুলিশ কর্মীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, এলাকায় নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, এই অঞ্চলের সকল মদের দোকান বন্ধ করতে হবে।

এই দাবিতে প্রতিনিধি দল বিধাননগর উত্তর থানার অফিসার ইনচার্জের কাছে স্মারকলিপি দেয়। তিনি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া এবং বাকি দাবিগুলি পূরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের জয়ে সংহতি মিছিল বর্ধমান শহরে। ১২ ডিসেম্বর

আসল শত্রু পুঁজিপতি শ্রেণি

একের পাতার পর

সমাজ প্রতিষ্ঠা করা না যাচ্ছে তত দিন পর্যন্ত জনগণকে ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে গেল, বহুজাতিক পুঁজিই জনগণের আসল শত্রু, মোদি সরকার তাদের মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও এই শিক্ষা বর্তমানে প্রাথমিক স্তরের একটা উপলব্ধি মাত্র, কিন্তু এই উপলব্ধি জনগণের চেতনায় আরও স্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত হবেই এবং বিপ্লবী শক্তির দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার পথেই নিপীড়িত জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার জন্ম দেবে। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন।

বহুজাতিক পুঁজির আক্রমণের বিরুদ্ধে এখন শ্রমিক-কৃষক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলছেন। শ্রমিক-কৃষকের এই ঐক্য ক্রমাগত শক্তিশালী হবে এবং ভবিষ্যতে আরও বড় ও মহত্তর আন্দোলনের জন্ম দেবে। আন্দোলনের বিজয়ের এই আনন্দের মধ্যে নানা ধরনের গণসংগ্রাম কমিটি গঠন করে আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি।

এমএসপি ঃ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই আপত্তি

তিনের পাতার পর

সমস্ত কৃষিপণ্যকেই এই আইনের আওতায় আনতে হবে। এ না হলে কর্পোরেট হাঙররা, বড় মাঝারি নানা মাপের ব্যবসায়ীরা কৃষককে ঠকানোর সেই ট্র্যাডিশনই বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাবে।

এমএসপিতে সরকারের আপত্তি কেন

দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান ২০ শতাংশ। কিন্তু শুধু শতাংশ দিয়ে কৃষির গুরুত্ব বোঝা যাবে না। গোটা জাতিকে খাদ্য জোগানোর দায়িত্ব পালন করেন কৃষকরা। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ কৃষির সাথে যুক্ত। তাই কৃষির অবদান শুধু অর্থনীতির নিছক কিছু সংখ্যাতত্ত্বের মানদণ্ডে মাপলে ভুল হবে। মাপতে হবে জীবনের মানদণ্ডে। কৃষির এই গুরুত্ব শাসক বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের পক্ষেও অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তাঁরা যা অস্বীকার করছেন তা হল, যাঁরা কৃষি অর্থনীতির নির্মাতা, অর্থাৎ যাঁরা উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলান, সেই কৃষকদের প্রাপ্যটুকু স্বীকার করতে, তাদের অধিকারের মান্যতা দিতে।

কৃষকদের প্রাপ্য কতটা? কৃষক মানে কৃষক পরিবার। কারণ, ফসল ফলাতে কৃষকের গোটা পরিবার মেহনত দেয়। ফসলের খরচের হিসাবের সময় মেহনতের এই হিসেবটা ভুলে গেলে চলবে না। যদিও সরকারি কর্তারা এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা অধিকাংশ সময়ই ভুলে যান। কৃষকরা চাইছেন মজুরি সহ কোনও ফসল উৎপাদনের যা খরচ তার সঙ্গে তাঁদের পরিবার প্রতিপালনের খরচটাও, অর্থাৎ পরিবারের ভরণপোষণ, সকলের চিকিৎসা, লোকলৌকিকতা, সন্তানদের পড়াশোনা প্রভৃতি খরচটাও যোগ করা হোক। এটাই তো স্বাভাবিক এবং ন্যায্য হিসেব। কেন ন্যায্য? কারণ, না হলে ভবিষ্যতে কৃষির কাজের জন্য কেউ টিকে থাকবে না। কৃষকের তো অন্য কোনও রোজগারের উপায় নেই। স্বামীনাথন কমিশনও এই হিসেবই দিয়েছে। তা মোটের উপর কৃষির খরচের সাথে আরও ৫০ শতাংশ।

এটা নিশ্চিত করতেই সরকারের আপত্তি। কেন? প্রধানমন্ত্রী এই হিসেবের কোন অংশটা বাদ দিতে চান? নাকি মনে করেন কৃষকদের মানুষের মতো না বেঁচে শুধু উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে কোনও ক্রমে টিকে থাকলেই হল! শিল্পপতিরা যখন শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়মূল্য ঠিক করে, তখন তো যথেষ্ট লাভ ধরে হিসেব করার আইনসম্মত অনুমতিই সরকার দিয়ে থাকে। তা হলে কৃষি-ফসলের ক্ষেত্রে তা হবে না কেন? কেউ কেউ যুক্তি করছেন, এমএসপি ঘোষণা করলে আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের প্রতিযোগিতায় দেশ পিছিয়ে যাবে। এমন অদ্ভুত যুক্তি তাঁরাই করতে পারেন, যাঁরা কৃষকদের দেশের স্বাধীন নাগরিক বলেই মনে করেন না— যাঁদের বেঁচে থাকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ভোগ করার সমান অধিকার রয়েছে। না হলে, শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রে তো এমন যুক্তি আসে না। দেশের যে সব শিল্পপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সাফল্য এনে দিচ্ছে, সেই সব পণ্যের উৎপাদক শিল্পপতিরা কি লোকসান করে রফতানি করে? তাঁদের কি কৃষকদের মতো এমন করে আত্মহত্যা করতে হয়? না, বরং তাদের মুনাফা— এমনকি করোনায় যখন দেশের বেশির ভাগ অংশের মানুষের জীবিকা তলানিতে তখনও অস্বাভাবিক রকমে বেড়েছে। তা হলে কৃষি পণ্যের বেলায় সরকার কৃষকদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবে কেন?

সরকার ২৩টি ফসলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যে এখন ঘোষণা করে, তার মানে তো সরকার মনে করে এগুলিতে কৃষকের এই পরিমাণ মূল্য পাওয়া দরকার। তাই যদি হয় তবে তা পাওয়ার ব্যবস্থা সরকারি ভাবে সুনিশ্চিত করতে এত গড়িমসি কেন? তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটা কৃষক ন্যায্য দাম না পেলে আর কী উপায়ে হতে পারে! দ্বিতীয়ত, সরকার যদি দাম বেঁধে দেয় তবে সেই দামে বেসরকারি ক্রেতা তথা খাদ্যপণ্যের ব্যবসায়ীরাও কিনতে বাধ্য থাকবে। সরকারি বিশেষজ্ঞরা কেউ কেউ যুক্তি তুলছেন, এর ফলে খাদ্যপণ্যের দাম অনেকখানি বেড়ে যাবে। একেবারেই তা নয়। এখন যে চাষির থেকে ব্যবসায়ীরা জলের দামে ফসল কিনে নেয়, তাতে কি সাধারণ মানুষ সস্তায় খাদ্যপণ্য কিনতে পারে? যে আলু চাষিরা ৪-৫ টাকা দামে বেচে সেই আলুই চিপস তৈরি করে প্রতি ৫ গ্রাম ১০ টাকা দামে বিক্রি করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। সরষে যখন চাষিরা বিক্রি করে তার কোনও ন্যূনতম মূল্য নেই, কিন্তু আদানিদের সরষের তেলের এমআরপি (ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস বা সর্বোচ্চ খুচরো দাম) কিন্তু নির্দিষ্ট এবং সেই এমআরপি তারাই ঠিক করে। স্বাভাবিক ভাবেই কৃষকরা এই প্রশ্ন তুলছে যে, এমআরপি আইনসিদ্ধ হলে এমএসপি হবে না কেন?

একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই
এমএসপিতে আপত্তি সরকারের

আসলে সরকার মানেই কোনও না কোনও শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী সরকার— হয় শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ তথা শোষিত অংশের মানুষের সরকার, না হয় শাসক তথা শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির সরকার। আমাদের দেশে যে সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে, সেই সরকারটা যদি জনগণের সরকার হয়, শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের সরকার হয়, তবে দেশের কৃষক শ্রেণি, যারা দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ, যারা গোটা জাতিকে খাওয়ানোর দায়িত্ব পালন করে, তারা তাদের পরিশ্রমের ফলটুকু যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করতে সরকার এত গড়িমসি করবে কেন? বরং সরকার তো নিজের থেকেই এমন ব্যবস্থা নেবে যাতে সমাজের কোনও অংশের মানুষই তার পরিশ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত না হয়। বিজেপি সরকার তা করছে কি? বাস্তবে করছে না শুধু নয়, কৃষকরা যাতে ফসলের ন্যায্য মূল্য না পায়, এবং সেই মূল্য যাতে মুনাফার আকারে একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের ভাণ্ডারে গিয়ে জমা হতে পারে তার ব্যবস্থাই করছে। তার জন্যই কৃষি আইন। তার জন্যই এমএসপি না মানতে চাওয়া। একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ দেখতে গিয়েই সরকার কৃষকদের স্বার্থকে তাদের পায়ে বিসর্জন দিচ্ছে। এতে প্রমাণ হয় যে, সরকারটা কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের নয়, তা আসলে একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণিরই স্বার্থরক্ষাকারী সরকার। সরকারের একচেটিয়া পুঁজির তোষণনীতিই এমএসপি আইনসিদ্ধ করার ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা। যাঁরা সাধারণত সমাজে শ্রেণির অস্তিত্ব বুঝতে পারেন না বা বুঝলেও মানতে চান না, কৃষি আইন এবং তার বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন তাঁদের তা বুঝতে খুবই সাহায্য করবে।

সংস্কার মানে কী

সরকারের মন্ত্রীদের মুখে, খবরের কাগজের কলমচিদের লেখায়, সরকারি বিশেষজ্ঞদের মুখে 'সংস্কার' কথাটা এখন খুব শোনা যাচ্ছে। সকলেই বলছেন, কৃষিতে সংস্কার চাই। কৃষি আইন বাতিলের পর এক দল পণ্ডিত হাহুতাশ শুরু করে দিয়েছেন। এর ফলে নাকি কৃষিতে সংস্কার আটকে গেল। সংস্কার মানে কী? সংস্কার মানে তো নানা কারণে যে ব্যবস্থাটা মানুষের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে তাকে মেরামতের মধ্যে দিয়ে সহনীয় করে তোলা। তা হলে কৃষির ক্ষেত্রে সেই সংস্কারটা কী? চাষিরা ফসলের দাম পাচ্ছে না, ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। কৃষিউপকরণগুলি একচেটিয়া পুঁজির হস্তগত হওয়ায় তার দাম আকাশ ছুঁয়েছে। কৃষকরা চাষের খরচ জোগাড় করে উঠতে পারছে না। তাদের জন্য অল্প সুদে বা বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার। বহু ফসল সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তার জন্য আধুনিক হিমঘর তৈরি করা দরকার। এরকম আরও অনেক কিছু। সরকারি এই সংস্কারে কি কৃষককে এই সব সঙ্কট থেকে মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে? আদৌ নয়। যে সংস্কারের পরিকল্পনা সরকারের নেতা-মন্ত্রী-বিশেষজ্ঞরা করেছেন, তার একটাই মানে, তা হল গোটা কৃষি ব্যবস্থাটিকেই একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়া। কৃষকরা হবে সেই মুনাফা লোটার যন্ত্রমাত্র। এই সংস্কারের লক্ষ্য কৃষককের কল্যাণ নয়, এর সাথে কৃষক-স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত দেশের সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতা তলানিতে। উৎপাদন শিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিপুল পুঁজির মালিক দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা করে দেওয়ার জন্যই 'সংস্কার' নাম দিয়ে কৃষিক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা। তাদের লক্ষ্য, কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি এবং দেশের উচ্চস্তরের বা পাঁচ শতাংশের জন্য বাছাই করা কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও সরবরাহ। কৃষকদের স্বার্থকে বলি দিয়ে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষার এই অপচেষ্টাকে আপাতত কৃষকরা রুখে দিতে পেরেছে। সামজজীবন তথা অর্থনীতির অন্য ক্ষেত্রগুলিতে যেখানে এই সংস্কার অনেক আগেই সরকার শুরু করেছে, কোনও ক্ষেত্রেই তার ফল জনগণের জন্য সুফল দেয়নি। বরং তাদের ঘাম-রক্ত শোষণ করে পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার পাহাড় আরও উঁচু হতেই সাহায্য করেছে।

এমএসপির জন্য
খরচের সরকারি হিসেব ঠিক নয়

এবার আসা যাক খরচের প্রশ্নে। প্রথমত, সরকার কৃষকদের বাঁচানো তথা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেওয়া জরুরি মনে করে কি না? যদি করে তবে অর্থের সংস্থান সেখানে বাধা হতে পারে না। সরকার যে পরিমাণ অর্থ প্রতি বছর পুঁজিপতিদের ট্যাক্স ছাড় দেয়, ঋণ মকুব করে দেয়, দুর্নীতিতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ তছনছ হয়, কৃত্রিম যুদ্ধাতঙ্ক তৈরি করে মারণাস্ত্র কিনতে যা খরচ করে তার পরিমাণটা বিপুল। গত ৩০ বছরে দেশের ৫০টা পরিবারকে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে ৪০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। গত ৭ বছরে ওদের ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করা হয়েছে ১৪ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। ৫০টা পুঁজিপতি পরিবারের জন্য যদি এত খরচ করা যায় তবে দেশের কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের মুখে আহার জোগানোর অর্থ জোগাড় করা যাবে না কেন? এই অর্থের ভগ্নাংশ ব্যবহার করেও কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা যায়। উপরন্তু খাদ্যদ্রব্য সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে থাকলে তাদের হাতে যে অর্থ অতিরিক্ত হবে তা বাজারে শিল্পজাত দ্রব্য কিনতে ব্যয় হবে। এর ফলে বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি হবে, যা শিল্প-কারখানাগুলিকে চাঙ্গা হতে এবং পরিণতিতে গোটা অর্থনীতিকেই চাঙ্গা হতে সাহায্য করবে।

সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে

কৃষি-বাজারটির নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের হাতে থাকায় চাষির ফসলের দামের সঙ্গে কৃষিজাত খাদ্যপণ্যের দামের আকাশ-পাতাল ফারাক। ফসলের ন্যায্য দাম বেঁধে দিলে তাতে বাজারে পণ্যের দামও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে। সরকারকে ফসল ওঠার পর দ্রুত তার নিজস্ব এজেন্সিগুলিকে দিয়ে বাজারে ফসল কিনে নিতে হবে। তা হলে ব্যবসায়ীদের কাছে কৃষকদের জলের দামে ফসল বেচতে হবে না। তারাও বাধ্য হয় সরকারি দামে ফসল কিনতে। অন্য দিকে সরকারকে রেশনে নিয়মিত চাল-গম-চিনি এবং সাথে ডাল, তৈলবীজ বা ভোজ্য তেল সহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করার দায়িত্ব নিতে হবে। পাশাপাশি ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলে এই সব সামগ্রী সস্তায় জনগণকে বিক্রি করতে হবে। একেই আমরা বলছি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য। এমএসপি এই সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের একটি অপরিহার্য অংশ। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিরাট সংখ্যক বেকারের যেমন কাজের ব্যবস্থা হবে তেমনই সাধারণ মানুষও চড়া দামের হাত থেকে রেহাই পাবে।

আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়ের পর কৃষকরা আবার তাঁদের এলাকায়, পরিবারে, খেতে ফিরে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা সরকারের উপর এই আস্থা রেখেই ফিরে যাচ্ছেন যে, সরকার তার কথা মর্যাদা রক্ষা করবে। কোনও ভাবে সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে আন্দোলনের আগুনে পোড় খাওয়া কৃষকরা আবার আন্দোলন গড়ে তুলবেন। সে ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের বিপুল অভিজ্ঞতা তাদের আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

শুধু কৃষকদের দাবিগুলিই নয়, জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আগামী দিনে সঙ্কটগ্রস্ত একচেটিয়া পুঁজি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আক্রমণ আরও বাড়াবে। সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও এই অভিজ্ঞতা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আপাতত এই আন্দোলনের সাফল্যের উপর দাঁড়িয়েই এমএসপির দাবি আদায়ের আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের

১৪১তম জন্মদিবস ও ৮৯তম মৃত্যুদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

"ভগিনীগণ, চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন। অগ্রসর হউন। বুক ঠুকিয়া বল মা, আমরা পশু নই। বল ভগিনী, আমরা আসবাব নই। বল কন্যে, আমরা জড়োয়া অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই। সকলে সমস্বরে বল আমরা মানুষ।"

(জন্ম ঃ ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮০ — মৃত্যু ঃ ৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২)

পাঠকদের প্রতি আবেদন

প্রিয় পাঠক ও গ্রাহক বন্ধুরা,

মেহনতি মানুষের মুখপত্র গণদাবী গত সাত দশকের বেশি সময় ধরে এ দেশের মাটিতে বিপ্লবী গণআন্দোলনের বার্তা বহন করে চলেছে।

আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই পত্রিকা পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিক হতে পেরেছে। সম্প্রতি কাগজ, ছাপা এবং আনুষঙ্গিক খরচ বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় আর দু' টাকায় এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আপনাদের সুনির্দিষ্ট মতামত-পরামর্শ চাইছি।

ধন্যবাদান্তে

হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ ম্যানেজার, গণদাবী

অকাল বৃষ্টিতে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতি, পূরণের দাবি

অকাল বর্ষণে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সব ব্লকে আলুর জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় চাষ সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। চাষের জন্য তৈরি জমিতে জল জমে যাওয়ায় এখন আলু লাগানো প্রায় অসম্ভব। চড়া দামে চাষের উপকরণ কিনে চাষ নষ্ট হওয়ার কারণে চাষিরা পথে বসেছে। গত বছর আলুর দাম নামিয়ে দেওয়ার কারণে বিঘা প্রতি চাষে ২০-২৫ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছিল। এ বছরের বিপর্যয় চাষিকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। গড়বেতা-১,২,৩, চন্দ্রকোনা-১, চন্দ্রকোনা-২, শালবনি, কেশপুর, মেদিনীপুর সদর ব্লক সহ অন্যান্য ব্লকের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে পথে নেমেছে সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটি।

৮ ডিসেম্বর জেলা ডিডিএ-র কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। কমিটির দাবি, অকাল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করতে হবে, সারের কালোবাজারি রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে, বিনামূল্যে বীজ, সার সরবরাহ করতে হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন প্রদীপ মল্লিক, তাপস মিশ্র, বঙ্কিম মুর্মু, বীরেন মাহাত প্রমুখ।

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালিত

শিক্ষার প্রাণসত্তা হরণকারী সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে ৮ ডিসেম্বর সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালিত হল। রাজ্য রাজ্যে রাজধানী শহর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে ওই দিন অবস্থান, রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন, প্রতিবাদ মিছিল, বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ রাজ্যে জেলা সদর ও অন্যান্য শহরগুলিতে কর্মসূচি পালিত হয় এবং রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে গত ৩০-৩১ অক্টোবর এক সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার, সুখদেব থোরাট, জওহর নেশন, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, বিমল চ্যাটার্জী সহ প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীরা এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। সম্মেলনে নবগঠিত সর্বভারতীয় কমিটি এই আন্দোলনকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে এই প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছিল।

হাওড়া শহর

বর্ধমান শহর

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

জেলায় জেলায় আশাকর্মীরা আন্দোলনে

বেতন বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং অন্যান্য কয়েক দফা দাবিতে রাজ্যের জেলাগুলিতে সিএমওএইচ দপ্তরে হাজার হাজার আশাকর্মীর বিক্ষোভ সমাবেশ। ১০ ডিসেম্বর

ছবি ঃ বাঁ দিক থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর, হাওড়া, নদিয়া

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com